# আমাদের যীশুদা

**সদ্য প্রয়াত শিল্পী দিব্যেন্দু ভদ্র-কে (১৯৬০-২০১৫) নিয়ে লিখছেন তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়। এই লেখার মাধ্যমেই তিনি শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে চান তাঁর প্রিয় যীশুদা-র কাছে।**

কথা ছিল শিল্পীর নবজন্মে আমরা সবাই সাথী হব। সমব্যাথী হব। শিল্পী তার সৃষ্ট জোকারের মতই যে একা, নিঃসঙ্গ – তাই মহাকালের ডাকে তাঁর সেই নবজন্মে, হয়ত একরাশ দুঃখকে বুকে লালন করেই হাসতে হাসতে চলে গেল, ঠিক যেভাবে অন্ধকার মঞ্চকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে যেত তার সৃষ্ট জোকাররা – যারা আরো অনেক দিন আমাদের ব্যঙ্গ করে যাবে, আয়নায় আমরা নিজেদের দেখব আর হাসব, চোখের কোনায় শুকিয়ে যাওয়া জল শুধু জানিয়ে দিয়ে যাবে শিল্পী বড়ই নিঃসঙ্গ, একা।

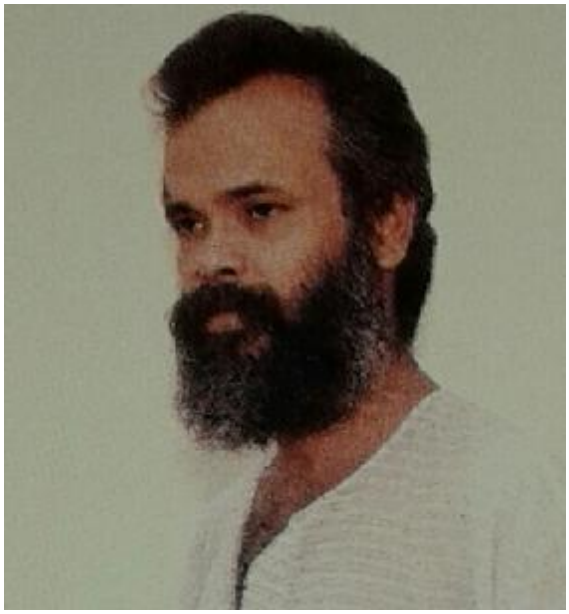

আমার বয়স তখন আর কতই বা – সাত-আট হবে হয়ত। আঁকার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তার পাশের সব লোক আমায় দেখছে আর হাসছে, কৌতুহলী জনতা আমায় দাঁড় করিয়ে দেখছে আর হাসছে, বাড়ি পিরে আয়নায় নিজেকে দেখে আমিও হেসে ফেললাম। দেখি – এ কি! আমি কই? এ তো জোকার!! যীশুদা আমায় জোকার সাজিয়ে দিয়েছে। আজও সে রং জীবন তেকে মুছতে পারলাম কই?

আমার ছোটবেলায় কলকাতার উপকণ্ঠে এক মফঃস্বল আগরপাড়া, সেখানে ছিল একটাই আঁকার স্কুল – যীশুদা যার নাম দিয়েছিল ‘হ য ব র ল’ – তার ছাত্র হলাম আমি। আঁকার স্কুল ছিল সপ্তাহ শেষের আনন্দের জায়গা। যীশুদার উপস্থিতিটাই ছিল ভীষণ আনন্দের। আমাদের মত বাচ্চারা তার দাড়িতে হাত বুলোতো, কোলে চড়ে বসে থাকত। আঁকার থেকেও বেশি চরিত্র গঠনের শিক্ষা ছোটবেলায় পেয়েছি আঁকার স্কুলে। যীশুদা আমাদের পিকনিকে নিয়ে যেত, আর নিয়ে যেত ম্যাজিক শো ইত্যাদিতে।

পরবর্তীতে এক সমাজ-সচেতন যীশুদাকে দেখেছি। মনে প্রাণে চেয়েছিল শিল্পের প্রসার। যীশুদা নিজে আগরপাড়ার ছেলে বলেই হয়ত আমাদের ঐ মফঃস্বলের ছেলেদের

ভাল-মন্দ আরো ভাল বুঝত। আমাদের মত মফঃস্বলের ছেলেদের মধ্যে আর্ট কলেজের বীজটি যীশুদাই বুনে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তার দায় ও দায়িত্ব তাদের বাবা-মার চেয়েও মনে হয় বেশি ছিল। এত কিছুর পরও শিশুর সরলতায় সবাইকে কাছে টেনে নিতেন। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল যীশুদা। আজও যারা তার ছাত্র ছিল তারা যীশুদার আদর্শ বহন করে চলেছে। নিজে যেমন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারত চাইত তার ছাত্রছাত্রীরাও পরিশ্রম করে সৎ আদর্শবান হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক্। মিথ্যে ও মেকিকে অন্তরদিয়ে ঘৃণা করত।

যীশুদার ভালো নাম দিব্যেন্দু ভদ্র। আশির দশকে ভর্তি হলেন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। শিক্ষক হিসাবে পেলেন কিংবদন্তী শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য্যকে। ড্রইং, জলরং, তেলরং সবেতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আর্ট কলেজে তখন ডিগ্রি চালু ছিল না। ছিল ডিপ্লোমা কোর্স। জড়িয়ে পড়লেন আন্দোলনে, যার ফলশ্রুতিতে কলেজে চালু হল ডিগ্রিকোর্স। আর্ট কলেজ পাশ করে স্কুলের শিক্ষকতা করতে চলে গেলেন কার্সিয়াং ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল, ডাউহিল-এ। কলেজে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন যার ফলে দেখেছি কার্সিয়াং-এ থাকাকালীন কত যে আর্ট কলেজ পড়ুয়া থেকে পাশ করা শিল্পীরা তাঁর কাছে আসত, থাকত – সে বড়ই আনন্দের দিন।

কিন্তু গতানুগতিকতা তো শিল্পীর বাঁধন। বেশ কয়েক বছর স্কুলের শিক্ষকতা করার পর হেলায় ছেড়ে দিলেন নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের নীড়। চাকরি যখন ছাড়লেন তার কয়েক বছর আগেই যীশুদা বিয়ে করেছেন। সেই সময় চাকরি ছাড়া শুধুমাত্র যে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল তাই নয়, ছিল ছবির প্রতি যীশুদার ভালবাসার এক অদম্য হার-না-মানা মানসিকতার প্রতিফলন। এর পরের জীবন শুধুই সফলতার – প্রথমে বরোদা ও তারপর দিল্লী। রাজধানী শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। আগরপাড়া থেকে দিল্লীর এই দূর্গম পথের সঙ্গী ছিল তন্দ্রাদি, যীশুদার বউ। জীবনে অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন যীশুদা, হয়েছে তাঁর ছবির অসংখ্য প্রদর্শনী। তার ছবিতে জগত সংসারের নট্-নটীরা উপস্থিত হয়েছে আলো-আঁধারের এক দূর্গম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যা তার ছবিকে এক অনন্য স্বকীয়তা দান করেছে, তার ছবি হয়ে উঠেছে বাঙ্ময়।

কত কথাই না মনে পড়ছে। কত বকাঝকা, কত আড্ডা ছোটবেলার সেই রোববারগুলো, ম্যাজিক শো, আরো কত কি ...!!! জীবন কুঁড়ি হয়ে আত্মপ্রকাশ করল, ফুল হয়ে সুরভিত করল, রং-এ আনন্দ দিল, অবশেষে ঝড়ে পড়ার সময় এল এবং তা এল

অসময়েই। শরতের কাল হয়ে ঝরে গেল এক মহামূল্য প্রাণ। একা করে দিয়ে গেল তন্দ্রাদি, পুচু আর আমার মত কত ছাত্রকে, যারা তার ছবির মতই হাতে গড়া, তারই সৃষ্টি।

কয়েকমাস আগে যখন শুনলাম যীশুদা অসুস্থ, কলকাতায় এসেছে – গেলাম দেখা করতে। হা হতোস্মিন, যেদিন আমি পৌঁছলাম সেদিন যীশুদা চলে গেছে শান্তিনিকেতনে। বড় ভালবাসতো খোয়াই আর বাউল গান। দিল্লীর চরম আধুনিক জীবনে হয়ত এই বাউল গানই এনে দিত একমুঠো খোলা আকাশ আর তার প্রিয় শান্তিনিকেতনকে। যাই হোক, দেখা হল না। দিল্লী ফিরে গিয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই খবর পেলাম হসপিটালে ভর্তি। মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যীশুদা হেলায় রোগকে হারিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসবে খোয়াই, কোপাই, কঙ্কালীতলায় – আসবেই।

কিন্তু যীশুদার খুব তাড়া ছিল। হয়ত দিল্লী, কলকাতা, শান্তিনিকেতনকে আর ভাল লাগছিল না। আরো ভাল কোনোও জায়গার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল ‘মন চল নিজ নিকেতনে’ গানের কথায়! কে জানে! আমার আর দেখা হল না।

ভোর বেলা সেই আলোকবার্তাটা এসে পৌঁছালো। যীশুদা আর নেই! সমস্ত মান-অভিমান, ভালো মন্দ সব কিছুকেই ম্লান করে দিয়ে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল – ‘তোমায় যে একটাও ছবি দেখাতে পারলাম না। যীশুদা।’

চিত্র পরিচিতি : শিল্পী দিব্যেন্দু ভদ্র ও তার আঁকা কিছু ছবি।